CAREERS360

WBCHSE
HISTORY
SAMPLE PAPER

ইতিহাস নমুনা প্রশ্নপত্র - ১

বিভাগ - ক

১। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়) ১ x ১০ = ১০

(ক) গান্ধি আরউইন চু ক্তি স্বাক্ষরিত হয় ------ সালে।

উত্তরঃ গান্ধি আরউইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৩১ সালে।

(খ) জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে কে 'নাইটহুড' ত্যাগ করেন ?

উত্তরঃ জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'নাইটহুড' ত্যাগ করেন।

(গ) কত খ্রিস্টাব্দে সাইমন কমিশন ভারতে আসেন ?

উত্তর ঃ ১৯২৭ খ্রীঃ সাইমন কমিশন ভারতে আসেন।

অথবা, 'হ্যাঁ' বা 'না' লেখো ঃ

'বাঘাযতীন' ছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলার অন্যতম বিপ্লবী নেতা ?

উত্তরঃ বাঘাযতীন ছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলার অন্যতম বিপ্লবী নেতা - না।

(ঘ) কাকে ভারতীয় সংবিধানের রূপকার বলা হয় ?

উত্তরঃ ডঃ বি. আর. আম্বেদকরকে ভারতীয় সংবিধানের রূপকার বলা হয়।

(ঙ) কোন্ সম্মেলনে 'পঞ্চশীল' নীতি 'দশশীল' নীতিতে পরিণত হয় ?

উত্তরঃ বান্দুং সম্মেলনে 'পঞ্চশীল' নীতি 'দশশীল' নীতিতে পরিণত হয়।

অথবা, 'ভারতীয় পরিকল্পনা কমিশন' কত খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয় ?

উত্তরঃ 'ভারতীয় পরিকল্পনা কমিশন' ১৯৫০ খ্রীঃ গঠিত হয়।

(চ) ঠান্ডা লড়াইয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রতিপক্ষ কে ছিলেন ?

উত্তরঃ ঠান্ডা লড়াইয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রতিপক্ষছিলেন সোভিয়েত রাশিয়া।

(ছ) কার নেতৃত্বে চিনে প্রথম প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ?

উত্তরঃ ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে চিনে প্রথম প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

অথবা, চিনে 'তুং চুন' কাদের বলা হত ?

উত্তরঃ চিনে সমর নেতাদের 'তুং চুন' বলা হত।

(জ) কবে চিন-সোভিয়েত মৈত্রী যুদ্ধ স্বাক্ষরিত হয় ?

উত্তরঃ ১৯৫০ খ্রীঃ চিন-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

(ঝ) তার নেতৃত্বে ভিয়েতনামে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় ?

উত্তরঃ হো-চি-মিনের নেতৃত্বে ভিয়েতনামে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

অথবা, ভিয়েতামিন কে সংগঠিত করেন ?

উত্তরঃ ভিয়েতামিন সংগঠিত করেন নগুয়েন আই কুয়োক বা হো-চি-মিন।

(ঞ) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত ?

উত্তরঃ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৫। ৫টি স্থায়ী রাষ্ট্র ও ১০টি অস্থায়ী রাষ্ট্র।

বিভাগ - খ

২। **নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষ্মীয়)** ২ x ১০ = ২০

(ক) কে, কেন 'বেঙ্গল প্যাক' (১৯৩২) গড়ে তোলেন ?

উত্তরঃ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হয়ে বাংলায় হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ১৯২৩ খ্রীঃ 'বেঙ্গল প্যাক' গড়ে তোলেন।

অথবা, কারা দিল্লীর আইন পরিষদে (১৯২৯) বোমা বিস্ফোরণ ঘটাল ?

উত্তরঃ হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম নেতা ভগৎ সিং ও বর্ধমানের ছেলে বটুকেশ্বর দত্ত দিল্লীর আইন পরিষদে (১৯২৯ খ্রীঃ) বোমা বিস্ফোরণ ঘটান।

(খ) প্ল্যানিং কমিশনের কর্তব্য কাজ কী ছিল ?

উত্তরঃ প্ল্যানিং কমিশনের কর্তব্য কাজ হল দেশীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং দেশের কাজে সকল শ্রেণীর মানুষের নিয়োগে সুযোগ দিয়ে তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা। দেশের পরিকল্পিত উন্নয়নের স্বার্থে এইভাবে অর্থনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্ল্যানিং কমিশন কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক প্রকল্পগুলির উপযোগিতা পরীক্ষা

করে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য অর্থ সংস্থান ও বাস্তবায়ন ঘটায়।

অথবা, কবে কাদের মধ্যে 'পঞ্চশীল' নীতি গৃহীত হয় ?

উত্তরঃ ১৯৫৪ সালের ২৯শে এপ্রিল চিন ও ভারতের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভারতে আগত চিনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই ও জহরলাল নেহেরুর মধ্যে 'পঞ্চশীল' নীতি গৃহীত হয়।

(গ) স্বাধীনতার পরবর্তীকালে কোন্ কোন্ দেশীয় রাজ্য ভারতে অন্তর্ভুক্ত হয় ?

উত্তরঃ স্বাধীনতার পরবর্তীকালে জুনাগড়, হায়দ্রাবাদ, জম্মু-কাশ্মীর, ত্রিবাঙ্কুর, ভূপাল, কোচবিহার প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতে অন্তর্ভুক্ত হয়।

(ঘ) বান্দুং কোন্ রাষ্ট্রে অবস্থিত ? বান্দুং সম্মেলনকালে ওই রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন ?

উত্তরঃ বান্দুং ইন্দোনেশিয়াতে অবস্থিত। বান্দুং সম্মেলনকালে ঐ রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন আলি শাস্ত্রো মিদযোযো।

(ঙ) তাসখন্দ চুক্তি কবে ও কাদের মধ্যে হয় ?

উত্তরঃ ১৯৬৬ সালের ১০ই জানুযারী রাশিয়ার মধ্যস্থতায় ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে তাসখন্দ চুক্তি হয়।

(চ) কার কোন্ ভাষণ 'ফালটন বক্তৃতা' নামে খ্যাত ?

উত্তরঃ ১৯৪৬ খ্রীঃ ৫ই মার্চ প্রাক্তণ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইন্সটন চার্চিলের আমেরিকার মিসৌরি প্রদেশের ফালটনে ওয়েস্টমিনস্টার কলেজে সোভিয়েত আগ্রাসন সম্পর্কে প্রদত্ত ভাষণ 'ফালটন বক্তৃতা' নামে খ্যাত।

(ছ) পোটস্‌ডাম সম্মেলন কত খ্রিস্টাব্দে বসেছিল ? ওই সম্মেলনের মূল সিদ্ধান্ত কী ছিল ?

উত্তরঃ পোটস্‌ডাম সম্মেলন ১৯৪৫ খ্রীঃ ১৭ই জুলাই বসেছিল। ঐ সম্মেলনের মূল সিদ্ধান্ত ছিল বিজিত জার্মানীর পুনর্গঠন ও জার্মানীর কাছ থেকে প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত প্রশ্নের ও যুদ্ধকালে জার্মানীর সহযোগী দেশগুলির সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের বিষয়টির নির্ধারণ।

অথবা, ট্রুম্যান ডকট্রিন বা ট্রুম্যান নীতি কী ?

উত্তরঃ তুরস্ক ও গ্রীসকে সোভিয়েত প্রভাব থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে ১৯৪৭ খ্রীঃ ১২ই মার্চ প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান মার্কিন কংগ্রেসে একটি বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতায় তিনি তুরস্ক গ্রীস এবং বিশ্বের যে

কোনো দেশকে সোভিয়েত আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সামরিক ও আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। এই ঘোষণা 'ট্রুম্যান নীতি' নামে পরিচিত।

(জ) কবে কেন জেনেভা সম্মেলন বসেছিল ?

উত্তরঃ ১৯৫৪ খ্রীঃ ৮ই মে ভিয়েতনামে 'দিয়েন-বিয়েন ফু'র যুদ্ধে ফরাসী ঔপনিবেশিক শক্তির আত্মসমর্পনের (৭ই মে) অব্যবহিত পরেই ইন্দোচীন সমস্যার সমাধানকল্পে জেনেভা সম্মেলন বসে।

(ঝ) ইন্টারপোল (Interpol) কী ?

উত্তরঃ ইন্টারপোল হল আর্ন্তজাতিক পুলিশ সংস্থা, বিভিন্ন দেশের বন্দী প্রত্যার্পণের ব্যাপারে ইন্টারপোল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(ঞ) 'জি-৪' (G-4) গোষ্ঠী কী ?

উত্তরঃ 'জি-৪' গোষ্ঠী হল উন্নয়নশীল দেশগুলির একটি অর্থনৈতিক সহায়ক গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত চারটি দেশ - ভারত, ব্রাজিল, জার্মানী ও জাপান। এই দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সহায়তা ও বাণিজ্যিক আদানপ্রদানের জন্য এই গোষ্ঠীটি গড়ে উঠেছে।

বিভাগ - গ

৩। **নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষীয়)** ৫ x ৬ = ৩০

(ক) রাওলাট আইন কেন প্রণয়ন করা হয় ? ভারতবাসী কীভাবে এই আইনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় ?

উত্তরঃ ১৯১৯ খ্রীঃ-র সংস্কার আইনের খসড়া প্রস্তুত করতে ভারত সচিব মন্টেগু যখন ব্যস্ত সেই সময় ভারত সরকারও ভারতীয়দের রাজনৈতিক অধিকার খর্ব করতে এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করতে প্রস্তুত হয়, কুখ্যাত রাওলাট আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে। ইতিপূর্বে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেনকে লিখিত এক পত্রে ভারত সরকার এই অভিমত প্রকাশ করে যে যুদ্ধাবসানে ভারত সরকারকে এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে এবং মন্টেগু ও এই আশঙ্কা পোষণ করতেন। সুতরাং রাজদ্রোহিতা ও বৈপ্লবিক কার্যকলাপের প্রকৃতি ও প্রসার নিরূপণ করে তাকে দমন করার জন্য ভারত সরকার 'সিডিশন কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠন করে বিচারপতি স্যার সিডনি রাওলাটের সভাপতিত্বে। ১৯১৯ খ্রীঃ এই কমিটির সুপারিশগুলি আইনে পরিবর্তিত হয় যা কুখ্যাত

রাওলাট আইন নামে পরিচিত।

রাওলাট আইনের প্রধান শর্ত ছিল সরকার কেবলমাত্র সন্দেহবশেই যে কোনো ব্যক্তিকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার ও অন্তরীণ করতে পারবে। এছাড়া আরো অনেক আপত্তিকর শর্ত থাকায় এই আইনের বিরুদ্ধে ভারতের সকল রাজনৈতিক দল সোচ্চার হয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত নরমপন্থী নেতারাও তীব্র প্রতিবাদ করেন। কেন্দ্রীয় আইনসভার প্রতিটি বেসরকারী ভারতীয় সদস্য এই আইনের বিরোধিতা করেন। মহম্মদ জিন্না সহ চারজন এর প্রতিবাদে পদত্যাগ পর্যন্ত করেন। আইনসভার বাইরেও প্রতিবাদের ঝড় বইতে থাকে। 'অমৃতবাজার পত্রিকা', হিন্দু, দি নিউ ইন্ডিয়া পাঞ্জাবি বোম্বাই ক্রনিক্যাল প্রভৃতি সংবাদপত্রগুলি এই আইনের প্রতিবাদ করে। দঃ আফ্রিকা প্রত্যাগত বিজয়ী বীর মহাত্মা গান্ধী এই প্রতিক্রিয়াশীল আইনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেন। এই সংগ্রামকে কেন্দ্র করেই ভারত ইতিহাসে শুরু হয় নতুন সংগ্রাম, নতুন নেতৃত্ব ও নতুন যুগ।

(খ) তেভাগা সংগ্রামের বৈশিষ্ট্যগুলি কী ছিল ?

উত্তরঃ স্বাধীনতাপূর্ব বাংলার কৃষক আন্দোলনগুলির মধ্যে ১৯৪৬ সালে সংগঠিত তেভাগা আন্দোলন ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ একটি আন্দোলন। অধ্যাপক নরহরি কবিরাজের মতে তেভাগা আন্দোলন ছিল বর্গাদার ভাগচাষীদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের সংগ্রাম। ১৯৩৭ খ্রীঃ ফজলুল হক মন্ত্রীসভার নির্দেশে বাংলার ভূমিব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য যে ফ্লাউড কমিশন গঠিত হয়েছিল তার রিপোর্টে বাংলার ভাগচাষীকে উৎপন্ন ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছিল। ১৯৪৬ খ্রীঃ-র সেপ্টেম্বরে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভা' তেভাগা আন্দোলনের ডাক দিয়ে যে বিশিষ্ট দাবিগুলি পেশ করে সেগুলি হল -- (ক) উৎপন্ন ফসলের তিন-ভাগের দু-ভাগ দিতে হবে আধিয়ারদের, (খ) জমিতে ভাগচাষীকে দখলীস্বত্ব দিতে হবে, (গ) শতকরা সাড়ে বারো ভাগের বেশি অর্থাৎ মন প্রতি ধানে পাঁচ সেরের বেশি সুদ দেওয়া হবে না, (ঘ) রসিদ ছাড়া কোনো ধান দেওয়া হবে না, (ঙ) জোতদারের পরিবর্তে ভাগচাষীদের খোলানে ধান তুলতে হবে এবং (চ) জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ করতে হবে। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প যখন সমগ্র জাতিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, সে সময় হিন্দু-মুসলমান কৃষকরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জোতদারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। সাম্প্রদায়িকতার জিগির তুলেও তাদের বিভক্ত করা যায়নি। এটি ছিল একটি রাজনীতি সচেতন আন্দোলন। যেহেতু এর সংগঠক ছিল কম্যুনিস্ট পার্টি, তাই আন্দোলনের কর্মসূচী, কলাকৌশল সবই পার্টি নেতৃত্ব স্থির করেন। হাজী মহম্মদ দার্নেশ, চারু মজুমদার, নিয়ামত আলী, গুরুদাস তালুকদার ইত্যাদি সুদক্ষ নেতাদের পরিচালনাধীনে এই আন্দোলনে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ, প্রজাস্বত্ব আইন, বর্গাদার আইন প্রভৃতির পূর্বাভাস পাওয়া গিয়েছিল -- যা পরবর্তীকালের বামপন্থী আন্দোলনের দিশারী ও

পথিকৃৎ ছিল।

(গ) ওয়াভেল পরিকল্পনা কী ছিল ?

উত্তরঃ ওয়াভেল পরিকল্পনা -- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে ব্রিটিশ সরকার, অনুধাবন করতে পারে ভারতবর্ষে তাদের আধিপত্যের অবশ্যম্ভাবী অবসানের। মিত্রশক্তিভুক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া এই সময় ভারতের দাবি মেনে নেওয়ার জন্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের ওপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। এমতাবস্থায় ব্রিটিশ রক্ষণশীল দল ভারতীয়দের সঙ্গে একটি সমঝোতায় আসার জন্য ১৯৪৫ খ্রীঃ ১৪ই জুন ভারতের বড়লাট আর্কিবল্ড ওয়াভেল কংগ্রেস ও লীগের নিকট যে পরিকল্পনাটি পেশ করেন তাই ওয়াভেল পরিকল্পনা নামে পরিচিত।

পরিকল্পনার শর্তগুলির হল -- (ক) শীঘ্রই সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর ও সংবিধান রচনার কাজ শুরু করবে। (খ) নতুন সংবিধান রচিন না হওয়া পর্যন্ত ভারতীয়দের নিয়ে একটি অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠিত হবে। (গ) বড়লাটের কার্যনির্বাহক সমিতি পুনর্গঠিত হবে এবং তাতে একমাত্র বড়লাট ও প্রধান সেনাপতি ব্যতীত সকল সদস্যই ভারতীয় হবেন। (ঘ) কার্যনির্বাহক সমিতিতে বর্ণহিন্দু ও মুসলমানদের অনুপাত হবে সমান সমান। (ঙ) ভারতের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব যতদিন ব্রিটিশ সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকবে ততদিন সামরিক দপ্তরও ব্রিটিশ সরকারের হাতে থাকবে।

এই শর্তগুলিই ওয়াভেল পরিকল্পনার প্রকৃত বিষয়বস্তু ।

(ঘ) বার্লিন অবরোধ বা বার্লিন সংকট কী ছিল ?

উত্তরঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইউরোপে ঠান্ডা লড়াইয়ের সবচেয়ে উত্তেজক ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল জার্মানী। জার্মানীর পরাজয়ের ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে। আবার জার্মানীকে কেন্দ্র করেই যুদ্ধোত্তর বিশ্বের সংকট শুরু হয়। ইফাল্টা ও পটস্‌ডাম সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জার্মানী ও বার্লিন শহরকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকার অধীন চারটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছিল। বার্লিন শহরের অবস্থান ছিল জার্মানীর সোভিয়েত নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলের মধ্যে। পটসডাম সম্মেলনে সোভিয়েত তার অধিকৃত জার্মান অঞ্চল থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের অধিকার আদায় করে নিয়েছিল। সেই মতো তারা পূর্ব জার্মানী থেকে ব্যাপক হারে সম্পদ আদায় শুরু করে। পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির অধিকৃত জার্মানীর পশ্চিমাংশে অপরদিকে একটি সুসংবদ্ধ অর্থনৈতিক শক্তির বুনিয়াদ গড়ে ওঠে। এইভাবে জার্মানী বস্তুত দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায় -- পশ্চিমী জোট নিয়ন্ত্রিত পঃ জার্মানী এবং সোভিয়েত শোষিত পূর্ব জার্মানী ।

সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মানীতে তার বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে বার্লিন অবরোধ করে (২৪শে জুলাই, ১৯৪৮)। বার্লিন ছিল সম্পূর্ণভাবে (সোভিয়েত রাশিয়া নিয়ন্ত্রিত পূর্ব জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত। সোভিয়েত রাশিয়া কোনোভাবেই পঃ জার্মানীর অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন মানতে পারে নি। এই অবস্থায় পঃ জার্মানীর থেকে পূঃ বার্লিনের সমস্ত রকম যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। এই ঘটনা Berlin Blockade বা বার্লিন অবরোধ নামে খ্যাত। এই অবরোধের অর্থ ছিল পঃ বার্লিনের ২২ লক্ষমানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাব ও অনাহার, অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমী শক্তিবর্গ এই চাপের কাছে নতি স্বীকার না করে অসাধারণ দক্ষতায় দীর্ঘ দশমাস ধরে আকাশ পথে পঃ বার্লিনে খাদ্য ও পণ্য সরবরাহ করতে থাকে। সমগ্র বিশ্ব অবাক বিস্ময়ে এই অভূতপূর্ব আকাশ পরিবহন লক্ষ্য করে। অবশেষে ১২ই ১৯৪৯ সালে ২৯৩ দিন পর স্ট্যালিন এই অবরোধ প্রত্যাহার করেন। পশ্চিমী শক্তির নেতৃত্বে পঃ জার্মানীতে পৃথক যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় ও অপরদিকে পূর্ব জার্মানীতে সোভিয়েত নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়। এইভাবে প্রথম পর্যায়ে বার্লিন অবরোধ তথা সংকটের অবসান হয়।

(ঙ) মাও জে-দং এর নেতৃত্বে চিন কীভাবে কমিউনিস্ট দেশরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

অথবা, ভিয়েতনাম যুদ্ধে আমেরিকার পরাজিত হওয়ার কারণগুলি কী ?

উত্তর ঃ - ১৯৪৯ খ্রী ঃ ১লা অক্টোবরে মাও সে তুঙের নেতৃত্বে কম্যুনিষ্ঠ চীনের আত্মপ্রকাশ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগের একটি যুগান্তকারী ঘটনা। ১৯২৫ খ্রীঃ ডঃ সান ইয়াৎ সেনের মৃত্যুর পর অপেক্ষাকৃত দক্ষিণপন্থী মনোভাবাপন্ন চিয়াংকাই শেকের নেতৃত্বে সমগ্র চীন ঐক্যবদ্ধ হবার অল্পকালের মধ্যেই কুয়োমিনতাং ও কম্যুনিস্টদলের মধ্যে সংঘাত দেখা দেয়। কম্যুনিস্ট দলের অন্যতম সুদক্ষ নেতা নিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন মাও-জে-দং। এইসময় কম্যুনিস্ট নিধন চলতে থাকায় মাও-জে-দং ও তাঁর অনুগামী চু-তে গ্রামের কৃষকরা একত্রিত হয়ে কিয়াং সি প্রদেশে তাঁদের প্রধান ঘাঁটি গড়ে তোলেন। চীনে ইতিমধ্যে শিল্প বিপ্লব না হওয়ায় মাও তাঁর আন্দোলনের প্রধান চালিকাশক্তি হিসাবে কৃষকদের গড়ে তোলেন। ১৯২৮ খ্রীঃ তিনি কৃষকদের নিয়ে লালফৌজ গঠন করেন। ১৯৩১ খ্রীঃ তিনি চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির 'চেয়ারম্যান' নির্বাচিত হন। ইতিমধ্যে চিয়াং কাই শেকের কমিউনিস্ট দমনের জন্য প্রেরিত সৈন্যবাহিনীর আগমনে চীনে গৃহযুদ্ধ শুরু হলে সেই সুযোগর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে জাপান চীনের অধিনস্থ মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে। গৃহযুদ্ধ চলতেই থাকে, এমতাবস্থায় মাও সে তুঙের নেতৃত্বে পরিবার পরিজনসহ প্রায় এক লক্ষ কম্যুনিস্ট সরকারী বাহিনীর প্রতিরোধ ভেঙে ৬০০০ মাইল রাস্তা অতিক্রম করে ৩৭০ দিন পরে শেনসি প্রদেশে পৌঁছোয়। এই ঐতিহাসিক ঘটনাটিই 'লং মার্চ' নামে অভিহিত। এটি নিছক কোনো সামরিক অভিযান নয়। দেশ ও দেশের

মানুষকে জানতে বিভিন্ন নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হওয়ার জন্য এই লং মার্চ হয়েছিল। মাও-সে-তুঙের নেতৃত্বে শেনসি প্রদেশে একটি প্রায় স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় চিয়াং সেখনেও কম্যুনিস্ট দমনে সেনাবাহিনী পাঠান। ১৯৩৭ খ্রীঃ জাপানের আক্রমণের মোকাবিলা কুয়োমিনটং ও কম্যুনিস্ট দল একত্রে করলেও ১৯৪৫ খ্রীঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান আত্মসমর্পণ করার পর চীনে এই দুই দলের মধ্যে আবার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। মাও-সে-তুং-এর নেতৃত্বে কমিউনিস্টরা একের পর এক বিভিন্ন ভূখন্ড দখল করতে থাকলে চিয়াং ও তাঁর অনুগামীরা বিফল হয়ে ফরমোজা দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করে। এইভাবেই ১৯৪৯ খ্রীঃ ১লা অক্টোবর মাও-সে তুঙের নেতৃত্বে পিকিং -এ জনগণের প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সাম্যবাদী শাসন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে চিনের ইতিহাসে এক যুগের সমাপ্তি ঘটল -- শুরু হল এক নতুন যুগের যে যুগের ইতিহাস হল সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রগতির ইতিহাস।

(চ) উনিশ শতকের মধ্যভাগে আরব জাতীয়তাবাদ উন্মেষের কারণগুলি আলোচনা করো।

অথবা, সুয়েজ সংকট বলতে কী বোঝায় ? কেন এই সংকট দেখা যায় ?

উত্তর ঃ ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে আরবদের মধ্যে এক জাতীয়তাবাদী ভাবধারার সূচনা হয়। বিভিন্ন কারণের সমন্বয়ে এই চেতনার সূত্রপাত। ১) আরব দেশে সিরিয়া ছিল আরবি ভাষা, সাহিত্য ও জ্ঞান -বিজ্ঞান চর্চার অন্যতম পীঠস্থান। আরবের আব্বাসীয় খলিফাদের গৌরবময় অতীতের স্বর্ণযুগের নানা রচনা আরবদের স্বজাত্য-প্রীতি ও নিজেদের অতীত গৌরব সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। এই ভাবধারা সিরিয়া থেকে সমগ্র আরব দুনিয়া সম্প্রসারিত হয়। ২) উনিশ শতক থেকেই আরবীয়রা পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করে, পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ফলে আরবদের মনে জাতীয়তাবাদী চেতনার সঞ্চার হয়। ৩) ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তুরস্ক সাম্রাজ্যের অবস্থান ও দুর্বলতা ক্রমশঃ প্রকট হওয়ায় তুরস্কের স্বৈরশাসনের অবসান ও স্বায়ত্তশাসন লাভের আশায় আরবীয়রা উদ্‌বেলিত হয়। ৪) এ সময় তুরস্কেও সুলতানের স্বৈর শাসনের বিরুদ্ধে ‘তরুণ তুর্কি আন্দোলন’ গড়ে উঠেছিল। এই আন্দোলন আরব জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে প্রেরণা সঞ্চার করে। তাই তারা সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদের বিরুদ্ধে তরুণ তুর্কী আন্দোলনে সহযোগিতা করে, সুলতানের মৃত্যুর পর যখন তরুণ তুর্কীদল ক্ষমতা হাতে পায়, তারা আরব জাতীয়তাবাদের কিশলয়টিকে উপড়ে ফেলে তুরস্কের হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হয়। ফলে আরবদের আশা ভঙ্গ হয়। স্বাধীনতা লাভের আশায় তারা বিভিন্ন স্থানে গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করে। জাতীয়তাবাদী নেতাগণ পত্রপত্রিকা ও পুস্তিকার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদের প্রচার চালাতে থাকেন। ৫) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক জার্মানীর পক্ষে যোগ দেয়। যুদ্ধান্তে আরবদের স্বাধীনতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও প্যারিসের

সম্মেলনে ভার্সাই সন্ধিতে আরবের অধিকাংশ অঞ্চলই মিত্রশক্তির ম্যান্ডেট হিসাবে রাখা হয়।

বিভাগ - ঘ

৪। **নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়)** ১০ x ৪ = ৪০

(ক) আইন-অমান্য আন্দোলনের কারণগুলি আলোচনা করো । এটা কতদূর সফল হয়েছিল ?

উত্তরঃ মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে যে তিনটি সর্বভারতীয় আন্দোলন আসমুদ্রহিমাচলকে এক সার্বিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল তাদের মধ্যে আন্দোলন। এই আন্দোলনটি এমন একটি সময়ে সংগঠিত হয়েছিল যখন দেশের পরিস্থিতি ছিল রীতিমতো অগ্নিগর্ভ। ১৯২৯ এর বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা ভারতকেও এক তীব্র আঘাত করেছিল। বিশ্বব্যাপী মন্দা ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক বন্ধন শিথিল করে দিয়েছিল। কাঁচা তুলো, পাট, ধান ও অন্যান্য কাঁচা পণ্যের মূল্য খুব কমে গেলে বাংলা, বিহার ও উত্তরপ্রদেশে কৃষকদের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়ে। তার ফলে রাজস্বের হার, খাজনা ও সুদের বোঝা আরও তীব্র হল। কৃষিপণ্যের মূল্য কমায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তুলনায় সচ্ছল বা মাঝারি কৃষকরা যারা বাজারের কথা ভেবে উৎপাদন করত। তারা কংগ্রেসের পতাকার তলায় বেশি বেশি করে সমবেত হয়। জমিদারি বিলোপের মতো র‍্যাডিকাল দাবিও তারা জানাতে থাকে। সরকার নিষ্ঠুর দমননীতির পথ গ্রহণ করলে অবস্থা আরও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। (২) এ সময় ভারতে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার আমদানি, কমিউনিস্ট ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দলের নেতৃত্বে শ্রমিক, মজদুর ও কিষাণদের সংঘবদ্ধ আন্দোলন এবং কমিউনিস্ট নেতৃবর্গের বিরুদ্ধে নানা দমনপীড়ন দেশে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, শিক্ষিত তরুণ প্রজন্মের মধ্যেও জঙ্গীভাব জেগে ওঠে। ১৯২৭ খ্রীঃ শ্রমিক ও কৃষক দল গঠিত হয়। তারা জাতীয় কংগ্রেসকে র‍্যাডিকাল আন্দোলনের জন্য চাপ দিতে থাকে। (৩) ভারতীয় বিপ্লবীরা এ সময় অতি সক্রিয় ছিলেন। স্যান্ডার্স হত্যা, কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে বোমা নিক্ষেপ, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা, যতীন দাসের মৃত্যু যুব সমাজকে প্রবলভাবে উত্তেজিত করে। (৪) ইংরেজ সরকারের অসম-বাণিজ্যিক নীতিতে ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণী ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। তারা উপলব্ধি করে যে প্রকৃত 'স্বরাজ' ব্যতীত ইংরেজ পুঁজিপতিদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া যাবে না। (৫) সাইমন কমিশনকে কেন্দ্র করে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ের নতুন পর্ব শুরু হয়। কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব ও রক্ষণশীলরা রাশ টেনে ধরলেও তরুণ প্রজন্মকে রুখে দেওয়া যায় নি। কংগ্রেস ও তার সকল গোষ্ঠী উপলব্ধি করে যে একমাত্র প্রবল গণ আন্দোলনই সরকারকে ভারতীয়দের দাবি মানতে বাধ্য করবে।

গণ মানসিকতার পরিবর্তনের এই প্রেক্ষাপটেই বিচার্য ১৯২৯-এ কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে পূর্ণ স্বারাজের ঘোষণা এবং আইন অমান্য আন্দোলন। গান্ধীজী এইসময় যুক্তি দেখান যে, দেশকে হিংসাশ্রয়ী রাজনীতি, অরাজকতা ও সন্ত্রাসবাদের হাত থেকে রক্ষা করতে গেলে অহিংস আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা

করা ব্যতীত গত্যান্তর নেই। অহিংস দর্শনে বিশ্বাসী গান্ধীজী এগারো দফা দাবী সহ ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকায় সরকারের উদ্দেশ্যে একটি শাসন সংস্কারের প্রস্তাব পেশ করে উপযুক্ত ফল লাভে যখন ব্যর্থ হন তখন তিনি ১৯৩০ খ্রীঃ ১২ই মার্চ ডান্ডী অভিযানের মাধ্যমে আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা করেন।

সাফল্য -- আইন অমান্য আন্দোলন তার ঘোষিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হলেও ভারতীয় 'স্বরাজ' সাধনার ইতিহাসে তার গুরুত্ব অপরিসীম। আইন অমান্য আন্দোলন ছিল একটি সর্বাত্মক সর্বভারতীয় আন্দোলন, দরিদ্র, নিরক্ষর, মহিলা ও কিশোরদের যোগদান ছিল ব্যাপক। এই আন্দোলন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ওপর প্রবল আঘাত হানে। ভারতে ব্রিটিশ পণ্যের আমদানি প্রায় এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস পায়। বোম্বাইয়ে ইংরাজদের পরিচালিত ১৬টি বস্ত্রশিল্প বন্ধ হয়ে যায়। বিদেশী পণ্যাদি বয়কট ও স্বদেশী ব্যবহারের ফলে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের প্রসার লক্ষ্য করা যায়। খাদির প্রসার ঘটে ও ভারতীয় কুঠীরশিল্প লাভবান হয়।

আইন অমান্য আন্দোলনের অভিজ্ঞতা ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনকে সফল করে। ভারতের নারীমুক্তির ইতিহাসে এই আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম। এই আন্দোলনের ফলে সরকার উপলব্ধি করে যে জাতীয় কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে কোনো ভারতীয় সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এই আন্দোলন বহির্বিশ্বে সাড়া জাগায়, প্রমাণিত হয় যে ভারতের স্বাধীনতার সমস্যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঘরোয়া সমস্যা নয়। এই আন্দোলনের ফলে প্রমাণিত হয় যে কংগ্রেসই ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ দল। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি ঘটিয়ে গান্ধীজী তাদের নৈতিক বলে বলীয়ান করে তোলেন এই আন্দোলনের মাধ্যমে। পরোক্ষভাবে এই আন্দোলন ব্রিটিশ সরকারের প্রকৃত স্বরূপ জনগণের কাছে তুলে ধরে। ঐতিহাসিক রজনী পাম দত্তের মতে ১৯৩০-এর বিরাট আন্দোলনের শোচনীয় ব্যর্থতা স্বত্ত্বেও এই আন্দোলনের ঐতিহাসির কীর্তির গভীর শিক্ষা থেকে আমরা যেন কখনও বিস্মৃত না হই।

(খ) আজাদ-হিন্দ বাহিনীর প্রেক্ষিতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সুভাষচন্দ্র বসুর ভূমিকা আলোচনা করো।

উত্তরঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার দু'বছর বাদে ১৯৪১ খ্রীঃ ৭ই ডিসেম্বর জাপান মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। ইতিমধ্যে জাপান যখন দঃ পূঃ এশিয়ায় সগৌরবে তার আগ্রাসন নীতি জারি রেখেছে তখন জাপানের হাতে বন্দী হন প্রচুর ভারতীয় সৈন্য। ১৪নং পাঞ্জাব রেজিমেন্টের মোহন সিং এর নেতৃত্বে এই বন্দী সেনারা ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিতে রাজী হয়। এইসময় 'পূর্ব এশিয়ায়' ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জনক রাসবিহারী বসু জাপানে ছিলেন। ১৯৪২ খ্রীঃ ১লা সেপ্টেম্বর রাসবিহারী বসু আনুষ্ঠানিকভাবে সিঙ্গাপুরে 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' গঠন করেন। এই সেনাবাহিনী - ঐক্য, আত্মবিশ্বাস ও

আত্মোৎসর্গ - এই তিনটি আদর্শের ভিত্তিতে ভারতকে ব্রিটিশ শাসনমুক্ত করতে তৎপর ছিলেন। প্রতিষ্ঠাকালে মোহন সিং ছিলেন এর প্রধান সেনাপতি।

ইতিমধ্যে বাংলার বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র বসুর রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে বর্ণময় পর্বটি শুরু হয়েছিল। মাতৃভূমি ত্যাগ করে অক্ষশক্তির সাহায্যে ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ করার চূড়ান্ত পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে, সুভাষচন্দ্র প্রথমে কাবুল হয়ে সোভিয়েত রাশিয়ায় পৌঁছে অবশেষে জার্মানীতে এসে পৌঁছান। জার্মানীতে ইতিমধ্যে তিনি ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন 'ইন্ডিয়ান লিজিয়ন'। জার্মানীর সোভিয়েত আক্রমণ তাঁকে পীড়া দেয়। স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ের পর পরিস্থিতি আরও ঘোরাল হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে দঃ পূঃ এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতির নতুন সম্ভাবনা দেখা দেয়। ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে জাপান উৎসাহ দেখায়। অপরদিকে মোহন সিং এর সঙ্গে রাসবিহারী বসুর মতানৈক্যের ফলে ১৯৪৩ এর শুরুতে আজাদ হিন্দ বাহিনী কার্যত অচল হয়ে পড়ে। রাসবিহারী বসু ইতিপূর্বেই সুভাষচন্দ্রকে জাপান আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। ১৯৪২ খ্রীঃ-এর ১৩ই জুন প্রচন্ড দুঃসাহস ভর করে বিপদসংকুল সমুদ্রে সাবমেরিনে কয়েক হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে সুভাষচন্দ্র জার্মানী থেকে জাপান এসে পৌঁছলে জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। ১৯৪৩ খ্রীঃ ৪ঠা জুলাই সিঙ্গাপুরের এক বিশাল সভায় রাসবিহারী বসু সুভাষচন্দ্রের হাতে 'Indian Independence League'-এর সকল দায়িত্বভার অর্পণ করেন।

আজাদ হিন্দ বাহিনীর দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে। ২৫শে আগস্ট (১৯৪৩ সাল) সুভাষচন্দ্র আনুষ্ঠানিকভাবে আজাদ হিন্দ বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং সেনাবাহিনীর আমূল পুনর্গঠনের কাজে হাত দেন। চারটি ফ্রন্টে লড়াই করার জন্য তিনি চারটি ব্রিগেড তৈরী করেন। গান্ধী, আজাদ, নেহেরু ও সুভাষ ব্রিগেড। তিনি একটি নারীবাহিনীও গড়ে তোলেন যার নাম দিয়েছিলেন ''ঝাঁসির রাণী বাহিনী''। লক্ষ্মী স্বামীনাথন ছিলেন এই বাহিনীর নেতৃত্বে। শাহনওয়াজ খানের নেতৃত্বে সুভাষ ব্রিগেডই সর্বাগ্রে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হত। তিনি ছাড়াও জি.এস.ধিলোঁ ও পি.কে. সায়গল ছিলেন আজাদ হিন্দ বাহিনীর দুই বিশিষ্ট সেনাধ্যক্ষ।

১৯৪৩ খ্রীঃ ২১শে অক্টোবর সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরে স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। ২৩শে অক্টোবর আজাদ হিন্দ সরকার ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। কয়েকদিনের মধ্যে জাপান, জার্মানী, ইতালী সহ নয়টি দেশ এই সরকারকে স্বীকৃতি জানায়। ৬ই নভেম্বর জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো আনুষ্ঠানিকভাবে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ দুটি আজাদ হিন্দ সরকারের হাতে তুলে দেন এবং ৩১শে জিসেম্বর নেতাজী এই দুটি দ্বীপপুঞ্জের নাম রাখেন যথাক্রমে 'শহিদ' ও 'স্বরাজ'। নেতাজীর আহ্বানে প্রবাসী ভারতীয়রা মুক্তহস্তে যুদ্ধ তহবিলে দান করতে থাকেন। ১৯৪৪ জানুয়ারী মাসে সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ ফৌজের সদর দপ্তর রেঙ্গুনে স্থানান্তরিত করেন। জাপানী সেনাদের সহযোগিতায় ১৯৪৪ খ্রীঃ-এর মার্চে শুরু হয় ভারত অভিযান। সেনাদলের

সামনে তিনি ধ্বনি দেন 'দিল্লী চলো', কারণ দিল্লী ভারতের রাজধানী। মণিপুরে মৈরাং ও ইম্ফল তারা অধিকার করে নেয়। ৮ই এপ্রিল কোহিমা অবরুদ্ধ হয়। সুভাষ ব্রিগেডের একটি ব্যাটিলিয়ন চট্টগ্রামের কক্সবাজারের পঞ্চাশ মাইল পূর্বে ভারত ভূখন্ডের মৌডাক দখল করে ভারতীয় এলাকার প্রায় ১৫০ মাইল ব্রিটিশ শাসন মুক্ত করতে সক্ষম হয়।

ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের দিকে অগ্রসর হলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গতিপ্রকৃতি পরিবর্তিত হতে শুরু করে। জাপানের সরকার ব্রহ্ম সীমান্ত থেকে বিমান সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়। এছাড়া নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই বর্ষা নামায় এবং সৈনিকদের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় খাদ্য ও সাজসরঞ্জামের অভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজের অভিযান জাপানী অসহযোগিতার জন্য ব্যর্থতায় পর্যবাসিত হয়। ১৯৪৫ এর আগস্টে ব্রিটিশ বাহিনীর কাছে জাপান আত্মসমর্পণে বাধ্য হল। কথিত আছে তাইওয়ানের তাইহোক বিমানবন্দরে এক বিমান দুর্ঘটনায় সুভাষচন্দ্র বসুর কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে, তবে এই কাহিনীর সত্যতা সম্পর্কে সকলে একমত নন।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে সমস্ত ধারা ছিল, এই অভিযান ছিল তার শেষ প্রচেষ্টা। বিভিন্ন কারণে লক্ষ্য পূরণে সফল না হলেও নেতাজীর আজাদ হিন্দ বাহিনীর সংগ্রাম ভারতের মুক্তি আন্দোলনে এক সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল অধ্যায়। দিল্লীর লালকেল্লায় বন্দী সৈন্যদের বিচার শুরু হলে সারা দেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। প্রবল গণবিক্ষোভের ফলে দন্ডাদেশপ্রাপ্ত আজাদী সৈন্যদল মুক্তি পায়। INA এর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ভারতীয় নৌ বিমান বাহিনীতে বিদ্রোহ শুরু হয়। সৈন্যবাহিনীর আনুগত্য শিথিল হলে এবং শ্রমিক, ছাত্র যুব সমর্থনে বিক্ষোভ শুরু হলে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের মৃত্যুঘন্টা বেজে যায়। ঐতিহাসিক তারাচাঁদের ভাষায় বলা যায় -- "Subhas Chandra brought the Indian Question out of the narrow domestic sphere of the British Empire into the broad field of International Politics" স্বয়ং গান্ধীজী বলেন যে, ''আজাদ হিন্দ ফৌজ আমাদের সম্মোহিত করেছে । নেতাজীর নাম আমাদের যাদুমুগ্ধ করে। তাঁর লক্ষ্য ছিল উচ্চ; কিন্তু তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। কে ব্যর্থ হয়নি?''

(গ) জাতি সংঘের পরিচালনাধীন যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা কীভাবে ভেঙে পড়ে।

উত্তর ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের হিমশীতল ভয়াবহতা লক্ষ্য করে বিশ্বের রাষ্ট্রনায়কগণ আন্তর্জাতিক বিবাদ -বিসংবাদের শান্তিপূর্ণ সমাধানের উদ্দেশ্যে League of Nations বা জাতিসংঘ স্থাপন করা হয় ভার্সাই সন্ধির চুক্তিপত্রের একটি অংশ হিসাবে। বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে জাতিসংঘ তার দায়িত্ব পালনে সফল হয়। কিন্তু ত্রিশের দশকে একনায়কতন্ত্রী দেশগুলির বিস্তারনীতি নতুন সংকট সৃষ্টি করে। আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার স্বার্থেই জাতিসংঘের চুক্তিপত্রে যৌথ নিরাপত্তার নীতি অন্তর্ভূক্ত হয়েছিল। ত্রিশের দশকের শেষ দিকে একনায়কতন্ত্রী দেশগুলির প্রতি ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের তোষণনীতি জাতিসংঘের যৌথ নিরাপত্তার ব্যবস্থার মূলে ভাঙন ধরায়

এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনায় এই ব্যবস্থার সমাধি রচিত হয়।

যৌথ নিরাপত্তার ব্যবস্থা ভাঙনের জন্য জাতিসংঘের নিজস্ব কিছু দুর্বলতা জাতিসংঘের জন্মকাল থেকেই ছিল। কাঠামোগত দুর্বলতা। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির অসহযোগিতা যেমন সোভিয়েত রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানীর অসংযুক্তিকরণ, সংবিধানিক দুর্বলতা, সদস্য রাষ্ট্রগুলির আন্তরিকতার অভাব, বিভিন্ন রাষ্ট্রের আক্রমণাত্মক মনোভাব -- এই গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলির জন্যই জাতিসংঘ তার পরিচালনাধীনে যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুষ্ঠভাবে তত্ত্বাবধানে ব্যর্থ হয়।

জাতিসংঘের যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রথম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় দূরপ্রাচ্যে। জাতিসংঘের অন্যতম সদস্য হয়েও ১৯৩১ খ্রীঃ জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে যৌথ নিরাপত্তার ব্যবস্থার মূলে প্রথম কুঠারাঘাত করে। জাতিসংঘের সনদের ১১নং ধারা অনুযায়ী জাতিসংঘের কাছে চিন সুবিচার প্রার্থনা করে। এই ধারা অনুযায়ী লিগ পরিষদের যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ঐক্যমত্যের প্রয়োজন ছিল। জাতিসংঘ কাউন্সিল জাপানকে সেনা অপসারণের নির্দেশ দিলেও জাপান তা অগ্রাহ্য করে মাঞ্চুরিয়া দখল করে ও তার নতুন নাম দেয় 'মাঞ্চুকুয়ো'। জাতিসংঘের চুক্তিপত্রের ১০ ও ১৫ নং ধারা প্রয়োগ করে জাপানের প্রতি চিন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানালেও বৃহৎ শক্তিবর্গ তাতে রাজী না হওয়ায় পাঁচটি দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত লিন্টন কমিশন সরেজমিনে সমস্যার প্রকৃতি অনুসন্ধানের দায়িত্ব পায়। ১৯৩২ খ্রীঃ সেপ্টেম্বরে কমিশনের রিপোর্ট জাপানকে আক্রমণকারী দেশ হিসাবে চিহ্নিত করা হলেও জাপানের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়নি। শেষ পর্যন্ত ১৯৩৩ খ্রীঃ লিন্টন কমিশন নিয়ে ভোটাভুটি হলে অধিকাংশ সদস্য রাষ্ট্রই এই রিপোর্ট সমর্থন করলে জাপান লীগের সদস্যপদ ত্যাগ করে। বলা বাহুল্য লিন্টন কমিশনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয় নি। মাঞ্চুরিয়া সংকট সমাধানে লিগের ব্যর্থতা নিদারুণভাবে জনসমক্ষেপ্রকট হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয় ঘটনাটি হল মুসোলিনীর নেতৃত্বে ইতালীর আবিসিনিয়া আক্রমণ। ১৯৩৪ খ্রীঃ ইতালির সোমালিল্যান্ড ও আবিসিনিয়ার সীমান্তে অবস্থিত ''ওয়াল ওয়াল'' গ্রামে দুই দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে এক ছোট্ট সংঘর্ষের জন্য কিছু ইতালির সৈন্যের মৃত্যু হয়। ওই ঘটনার অজুহাতে মুসোলিনী আবিসিনিয়ার কাছে ক্ষতিপূরণ ও ক্ষমা প্রার্থনার দাবি করেন। আবিসিনিয়ার সম্রাট হাইলে সেলাসি জাতিসংঘে এর বিরুদ্ধে আবেদন জানায় ও লীগের হস্তক্ষেপ দাবি করেন। জাতিসংঘের দ্বারা সংগঠিত কমিটি নির্ধারিত আপস মীমাংসা ইতালী মানতে রাজী না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত ইতালী আবিসিনিয়া আক্রমণ করে ১৯৩৫ খ্রীঃ ৩রা অক্টোবর। ইতালীকে আক্রমণকারী দেশ রূপে চিহ্নিত করে তার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক শাস্তি ঘোষণা করলেও ব্রিটেন ইতালীকে তেল রপ্তানি করা বন্ধ না করায় ইতালীর চাপে সম্রাট হাইলে সেলামি দেশ ত্যাগে বাধ্য হন। ইতালীর রাজা আবিসিনিয়ার সম্রাট হন। ইরিত্রিয়া, সোমালিল্যান্ড ও আবিসিনিয়া নিয়ে 'ইতালীয় পূর্ব আফ্রিকা' নামে একটি

নতুন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৩৭ সালে ইতালী জাতিসংঘের সদস্যপদ ত্যাগ করে। ফলে জাতিসংঘের যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রহসনে পরিণত হন।

১৯৩৩ সালে জার্মানীতে হিটলারের ক্ষমতালাভের মধ্য দিয়ে জাতিসংঘের মৃত্যুঘন্টা বেজে ওঠে। নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে ১৯৩৩ খ্রীঃ হিটলার ফ্রান্সের সঙ্গে অস্ত্রের সমতা দাবি করলে, সেই দাবি অগ্রাহ্য করা হলে হিটলার জাতিসংঘের সদস্যপদ ত্যাগ করেন। এরপর হিটলার বন্ধনমুক্ত, শাসনমুক্ত হয়ে ভার্সাই সন্ধি ধারাবাহিকভাবে লঙঘন করতে থাকেন। ১৯৩৮ খ্রীঃ অস্ট্রিয়া দখল করেন প্রচুর সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধির দ্বারা। ১৯৩৯ খ্রীঃ চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করে নেন। ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স সম্পূর্ণ নীরব থেকে হিটলারের এই আগ্রাসী কার্যকলাপ সমর্থন করে গেছে এর পরিণতিতে জার্মানীর উগ্র সাম্রাজ্যবাদী ক্ষুধা ক্রমেই বেড়ে গেছে। জাতিসংঘও দুই বৃহৎ শক্তির নিষ্ক্রিয়তা ও ঔদাসীনতায় সব ক্ষেত্রেই প্রায় নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। শেষ পর্যন্ত ১৯৩৯ খ্রীঃ ১লা সেপ্টেম্বর জার্মানী পোল্যান্ড আক্রমণ করলে এবং ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স পোল্যান্ডকে সহায়তা করার জন্য ৩রা সেপ্টেম্বর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রণদামাম বেজে ওঠে।

এইভাবে জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ থেকে ১৯৩১ খ্রীঃ জাতিসংঘের যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার যে ব্যর্থতার প্রথম প্রমাণ পাওয়া যায় তা ক্রমশঃ আবিসিনিয়া সংকট ও হিটলারের আগ্রাসী যুদ্ধং দেহি মনোভাবের দ্বারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ১৯৩৭ খ্রীঃ জাপান পুনরায় চিন আক্রমণ করলে চিন জাতিসংঘে আবার আবেদন করে, কিন্তু জাতিসংঘ শেষ পর্যন্ত নিজের সমস্ত দায়িত্ব সদস্য রাষ্ট্রগুলির কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে পলায়নমুখী হয়ে ওঠে। অবশেষে ১৯৩৯ খ্রীঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার সংগঠকরূপে জাতিসংঘের শেষ চিহ্নটুকুও বিলুপ্ত হয়।

(ঘ) সোভিয়েত রাশিয়ার অবলুপ্তি কীভাবে বিশ্বের রাজনীতি অথবা অর্থনীতিকে প্রভাবিত করেছে?

উত্তরঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বরাজনীতির কাঠামোটি দাঁড়িয়েছিল দুই মহাশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ উপস্থিতির উপর, ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তি 'দ্বিমেরুযুক্ত বিশ্বব্যবস্থা'র অবসান ঘটিয়ে 'একমেরুযুক্ত নতুন বিশ্বব্যবস্থা'র জন্ম দিয়েছে। ঠান্ডা লড়াইয়ের যুগের একটি মহাশক্তি ঠান্ডা লড়াই উত্তর যুগেও নিজের শক্তিকে অটুট রাখতে পেরেছে। এক সময় মনে করা হত শান্তিপূর্ণ ও উন্নত বিশ্বের পূর্বশর্ত হল ঠান্ডা লড়াইয়ের অবসান। অন্যদিকে আবার এও বলা যায় যে ঠান্ডা লড়াইয়ের দুই প্রধান প্রতিপক্ষ কখনই প্রত্যক্ষ সমরে নেমে বিশ্বরাজনীতির বিন্যাস বদলে দেওয়ার চেষ্টা করেনি, এই কারণে স্নায়ুযুদ্ধকে জন গ্যাডিস 'দীর্ঘ শান্তির যুগ' বলে অভিহিত করতেও দ্বিধা করেননি, যদিও এমত আংশিক সত্য।

প্রকৃতপক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভৌগোলিক অস্তিত্ব বিলুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য রাষ্ট্রগুলির তালিকা থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের নামটি বিলুপ্ত হয়ে সেই স্থানে আসে বর্তমান রাশিয়ার

নাম। অন্যতম অপর মহাশক্তিরধর রাষ্ট্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সামনে তার সার্বিক প্রভাব বিস্তারে আর কোনো প্রতিপক্ষ না থাকায় পৃথিবীর শক্তিসাম্য বিনষ্ট হল। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা মাত্র একটি রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীভূত হল। ভূতপূর্ব সোভিয়েত ইউনিয়নের এককালীন অঙ্গরাজ্যগুলি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয়। চেকোশ্লোভাকিয়া ভেঙে গড়ে ওঠে চেক প্রজাতন্ত্র ও শ্লোভাকিয়া রাষ্ট্র। যুগোশ্লাভিয়ায় গড়ে ওঠে পাঁচটি রাষ্ট্র - ক্রোয়েশিয়া, শ্লোভেনিয়া, বসনিয়া - হার্জেগোভিনা, ম্যাসিডনিয়া এবং সার্বিয়া মন্টিনিগ্রো। পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের ১২টি রাজ্য গঠন করে C ± S বা Commonwealth of Independent States. রুশ ফেডারেশন সহ প্রাক্তণ সমস্ত সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলি আমেরিকার কাছে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য দ্বারস্থ হয়।

ঠান্ডা লড়াইয়ের অবসানের পর বিশ্বে এক নতুন যুগ শুরু হয়েছে। দীর্ঘ সাড়ে চার দশক ধরে চলা ঠান্ডা লড়াইয়ের অবসানের ফলে ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ফলে এই দ্বিমেরু প্রবণতার অবসান ঘটে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি, জর্জ বুশ (সিনিয়র) একে বা নতুন বিশ্বব্যবস্থা বলে অভিহিত করেছেন। মার্কিন রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশ (সিনিয়র) ১৯৯০ - ৯১ খ্রীঃ-র উপসাগরীয় যুদ্ধের মাধ্যমে প্রমাণ করতে সক্ষম হন। ঠান্ডা লড়াই-উত্তর জমানার একমাত্র মহাশক্তি হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী নতুন বিশ্বব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হল -- সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নেতৃত্বে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমানাধিকার সম্পন্ন কোনও বিশ্বব্যবস্থা নয়, প্রতিষ্ঠিত হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একক আধিপত্য যুক্ত আরও বেশি অসম এক বিশ্বব্যবস্থা। নতুন এই বিশ্বব্যবস্থাকে ধারণ করে আছে মার্কিন আধিপত্যবাদ ও বিশ্বায়ন।

বিশ্বরাজনীতিতে মার্কিন আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলেও তা কিন্তু একতরফা নয়। বিশ্বরাজনীতিতে আজ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ শক্তির উত্থান ঘটেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতৃত্বে ইউরোপ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মার্কিন আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। দুই জার্মানীর মিলনের ফলে বর্তমান ঐক্যবদ্ধ জার্মানী, জাপান অর্থনৈতিকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেও পিছনে ফেলে দিয়েছে। অঙ্গরাজ্য রাশিয়ার সম্ভাবনাও উজ্জ্বল। চিন ও একটি সম্ভাবনাময় শক্তি। আগামী দিনে হয়তো চিন আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠবে। অবশ্য বিশ্বরাজনীতিতে আমেরিকার আধিপত্য উল্টে দেবার ক্ষমতা এককভাবে এদের কারও নেই। এখানেই আমেরিকার সামরিক শক্তির গুরুত্ব। মধ্যপ্রাচ্য সংলগ্ন অঞ্চলে মার্কিন প্রভুত্ব এখনও সর্বাত্মক হতে পারে নি। মার্কিন আধিপত্যবাদ ও পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে সারা বিশ্বজুড়ে প্রতিবাদ প্রতিরোধ বিচিত্র ও খন্ড খন্ড রূপ নিচ্ছে। ঠান্ডা লড়াই-উত্তর এবং সোভিয়েতের অস্তিত্বহীন নতুন বিশ্বে ক্ষমতার ভারসাম্য আরও বেশি করে তৃতীয় বিশ্বের প্রতিকূলে চলে গেল। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা নয় তাকে তুষ্ঠ করে চলাই এখন তৃতীয় বিশ্বের বহু রাষ্ট্রের মূল উদ্দেশ্য।

বর্তমান বিশ্ব পরিচালনার মূল দন্ডটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার মুষ্টিবদ্ধ করে রেখেছে বিশ্বের অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে তার অর্থনৈতিক ঘাঁটি স্থাপন করে, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আমেরিকার সারা বিশ্বে পরমাণু শক্তি নাশ করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে এক আদর্শগত ভন্ডামি। তাই কি আফ্রিকায় কি মধ্যপ্রাচ্যে, কি লাতিন আমেরিকায় কিংবা দঃপূঃ এশিয়া বা দক্ষিণ এশিয়ার আমেরিকার দায়দায়িত্বের শেষ নেই। গণতন্ত্রের প্রধান প্রবক্তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গণতন্ত্রের স্বার্থে পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার লীলাভূমি মেসোপটেমিয়াকে ধুলায় মিশিয়ে দিতে দ্বিধা করে না যদিও আসল কারণ মধ্যপ্রাচ্যের বিশাল তৈলভান্ডারে মার্কিনী হস্তক্ষেপ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হওয়া।

বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্র তাদের জাতীয় নিরাপত্তায় যত অর্থ ব্যয় করে আমেরিকা একাই সেই পরিমাণ অর্থ খরচ করে তার নিজস্ব প্রতিরক্ষায়। এই বিপুল সামরিক শক্তিই আমেরিকার প্রভুত্বের প্রধান উৎস। বর্তমান বিশ্ব তাই সামরিকভাবে একমেরুযুক্ত। বিশ্বজুড়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আমেরিকার সাংস্কৃতিক আধিপত্য বা বিশ্বায়ন যা বিশ্ব পুঁজিবাদেরই সম্প্রসারিত রূপ। মার্কিন আধিপত্যবাদ ও পুঁজিবাদ বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে জগৎজুড়ে আজ প্রতিবাদ প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে। সোভিয়েত রাশিয়ার অবলুপ্তির ফলে বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতির নিয়ামক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হয়ে ওঠায় এবং বিশ্বে ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসবাদ ও জাতি গোষ্ঠীগুলির সংঘাতের সৃষ্টিতে অনেকেই একে ‘নতুন বিশ্ব - অ - ব্যবস্থা’ বলেছেন।